13.2.17

প্র:- মুকুন্দরামের কাব্যে দুঃখবাদ :— Imp

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে 'দুঃখবাদী কবি' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কাব্যে তৎকালীন বাস্তব জীবনের দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্গতির চিত্র পাই ঠিকই কিন্তু কবি দুঃখের বা দারিদ্র্যের জয়গান করেননি, এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয় —

"তাঁহার কাব্যে দুঃখের উল্লেখ থাকিলেও তিনি দুঃখবাদের কবি নহেন। দুঃখের অভিজ্ঞতা তাঁর মনস প্রবণতাকে এক বিশেষ রূপ দেয়, কিন্তু তাঁহার মনকে অপ্রীতিকর স্মৃতি-রোমন্থন ও নৈরাশ্যবাদের অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখে না।" * বাদ

— কবিকঙ্কন চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৪, ভূমিকা।

কবিকঙ্কন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বস্তুতিক্ত অভিজ্ঞতা, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি কোথাও এই তিক্ততা বা দুঃখকে প্রাধান্য দেননি, কবি 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারন' অংশে অনাচার সংকট, প্রজা-পীড়নের দুঃখ-দুর্দশাকে কৌতুক রসের মিশ্রনে বর্ননা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় —

"সরকার হইল কাল   খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি,
পোদ্দার হইল যম   টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥"

একথা ঠিক যে কবির দুঃখ বর্ননা কোথাও কোথাও পাঠক হৃদয়কে নাড়া দেয়, কারন 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারন' অংশে যখন কবি বলছেন —

"তৈল বিনা কৈল স্নান   করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে॥"

প্রকৃত দারিদ্র্য, দুর্দশার বিবরন দিতে গিয়ে কবি নিজ অসহায়তার কথা কোনোরূপ ভনিতা ছাড়াই তুলে ধরেছেন। কবি দুঃখের আধার এই জীবনকে সর্বান্তিকভাবে ভালোবাসেন, তা তাঁর কাব্যের সর্বত্রই পরিচয় (পাই) পাওয়া যায়।

দেবখণ্ডে 'হর-গৌরীর কলহ', 'গৌরীর খেদ' অংশে দাম্পত্য জীবনের দুঃখ বর্ণনার কথা রয়েছে। তবে কবি এই দুঃখ বর্ণনার মধ্য দিয়ে দুঃখ, দুর্দশাগ্রস্ত, ক্লান্ত হৃদয়ের সহনশীলতার কথাই ব্যক্ত করেছেন। 'গৌরীর খেদ' অংশে হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনায় পাই —

"কি জানি তপের ফলে বর মিলেছে হর।
পাটপড়শী নাহি অঙ্গে দেখি দিগম্বর।।
কপের আগে লোমের অঙ্কুর সদা করে কেলি।
গলার ভুজঙ্গ কাটে ঝুলি আমি এই গালি।।"

অথবা,
"দারুণ দৈবের ফলে হইনু দুঃখিনী।
ভিক্ষার ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী।।"

হর-পার্বতীর দারিদ্র্যগ্রস্ত দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবিই পাই 'আখেটিক খণ্ডে' 'ফুল্লরার খেদ' অংশে। এখানেও ফুল্লরা অভাবের পিছনে রয়েছে তাদের পরিশ্রম, শূন্য হাতে কালকেতু বন থেকে ফিরে এলে ফুল্লরা কপালে করাঘাত করে বলে —

"বিধাতা আমারে দণ্ডী জীবন্ত স্বামীতে রাণ্ডী
কৈল দৈব দুঃখের ভাজন।।"

অথবা,
"দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
চৈতিনু সম্বল-চিন্তা-মনোদে।।"

প্রকৃতপক্ষে এইসব দুঃখ বর্ণনার মধ্যে কবি দারিদ্র্য, দৈন্যকষ্টকে প্রকটতা দান করেননি। শুধু তাই নয় 'ফুল্লরার বারোমাস্যা'তে আমরা দেখতে পাই যে দেবী চণ্ডীকে সম্ভাবিত সপত্নী মনে করে দেবীর মনে ভয় সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই এই বারোমাসের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা। ফুল্লরা দেবীকে তার দুঃখ অবস্থানের কথা বলেছে —

"দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।"

মুকুন্দই　　　　তাই　　　　দুঃখবাদ – ৩

এই/ দুঃখ বর্ণনার কথা/ সমালোচকের ভাষায় বলা যায় —

"কিন্তু এই চিত্র আঁকিবার সময়ে কবি যে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন অশ্রুমোচন করিতে ছিলেন না পরন্তু বিবদমান দুই নারীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া ও তাহাদের বিভিন্ন রোষ প্রতিবিম্বী মুখের দিকে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতে ছিলেন এই দৃশ্য হয় আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।"

যদিও সমালোচকরা 'পশুগনের দুঃখ নিবেদন' অংশের উপর জোর দিয়ে থাকেন। কারন এর মধ্যদিয়ে কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ফুটে উঠেছে। কালকেতুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভালুক বলেছে—

"উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরি নই না করি তালুক।।"

এখানেই তাদের তৎকালীন অত্যাচার-নিপীড়নের চিত্র স্পষ্ট। যা খুবই দুঃখদায়ক। তবে কবির নিজ জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতা তাঁকে জীবন সম্পর্কে আরও দরদী করে তুলেছেন। তিনি দুঃখের ভিতর থেকে রসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন — যা নৈরাশ্য পর্যবসিত নয়।

পরিশেষে সমগ্র আলোচ্য অংশের ভিত্তিতে বলা যায় যে 'তাঁহার কাব্যে দুঃখের উল্লেখ থাকিলেও তিনি দুঃখবাদের কবি নহেন।' এই মন্তব্যকে সমর্থন করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ———

"মুকুন্দরাম দুঃখ বর্ণনার কবি কিন্তু দুঃখবাদী নহেন। তাঁহার অন্তরাত্মাটি পরম আশাবাদীর জীবন সঙ্গীত।"